জয় গোস্বামী

আমাকে, আশ্চর্যময়ী

প্রেম বলে দোষ দাও? এই দোষ পেয়েছি আগেও!
জল থেকে, হাওয়া থেকে, পাশের নিঃশ্বাস থেকে আসে—
জ্বর থাকে কয়েকদিন, কয়েকমাস, কয়েক যুগেও
সারে না অনেকক্ষেত্রে। সারেও বা। লিখতে লিখতে যেরকম কবি
একটি বিশ্বাস ভেঙে চলে যায় অপর বিশ্বাসে...

জয় গোস্বামীর কবিতাচর্চার ধারাবাহিকতাকে লক্ষ করতে গেলে দেখা যাবে,— সেখানে 'তোমাকে, আশ্চর্যময়ী' এই শীর্ণ কবিতাপুস্তকটির একটি বিশেষ স্থানাঙ্ক আছে। কেননা, এর ঠিক আগের বই হল 'মা নিষাদ'। আর পরের বই 'সূর্য-পোড়া ছাই'। তিনটি বই তিন রকম। লেখকের কাছে জানা যায়, 'মা নিষাদ'-এর পাণ্ডুলিপি জমা দেবার পরপরই লেখা হয় এই একগুচ্ছ প্রেমের কবিতা। তার কিছুকাল পর 'সূর্য-পোড়া ছাই' লেখা শুরু। দুটি গুরুত্বপূর্ণ পর্বের মাঝখানে ক্ষীণকায় এই বইটি যেন দুটি দেশের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া একটি নদী। বা সীমান্তরেখা।

এই বইটি ইদানীং পাওয়া শক্ত। আমরা যখন আবার প্রকাশ করতে চাইলাম, লেখক এতে যোগ করে দিলেন এই কবিতাগুচ্ছটির সমসাময়িক, একেবারে প্রায় পাশাপাশি লেখা, একটি গল্প। লেখকের মত হল, একই অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত এই গদ্য, এখন থেকে, তার একদা সহযাত্রিণী কবিতাবলীর সঙ্গে সঙ্গে থাকুক। এতে, পাঠকের কাছে 'তোমাকে, আশ্চর্যময়ী' আরেকটু সম্পূর্ণ হবে।

শরীর, শরীর বড়ো ঘন হয়ে জড়িয়ে থাকে সেখানে। অথচ বেদনার নীল রং একইভাবে বুনে যায় সংযম ব্যবধান। থৈ থৈ ব্যাকুলতায় জড়িয়ে যায় অনন্ত বিষাদ। সব প্রেমেরই গোপন নাম যন্ত্রণা। স্তব্ধতা নেমে আসে, পাঠের পর। 'তোমাকে, আশ্চর্যময়ী'-র কবিকে তন্ন তন্ন করে আবারও ফিরে ফিরে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে।

জয় গোস্বামীর জন্ম ১০ নভেম্বর ১৯৫৪, কলকাতায়। পরে, ৫ বছর বয়স থেকে সপরিবারে রানাঘাটে। বর্তমানে, ৩০ বছর পর, পুনরায় কলকাতাবাসী। বাবা মারা যান ৮ বছর বয়সে। মা স্কুলে পড়াতেন। মায়ের মৃত্যু ১৯৮৪। শিক্ষা : একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত, রানাঘাটেই। প্রথম কবিতা লেখা, ১৩ বছর বয়সে, বাড়ির পুরনো সিলিং পাখা নিয়ে। প্রথম কবিতা ছাপা হয় উনিশ বছর বয়সে, একই সঙ্গে তিনটি ছোট পত্রিকায়, সীমান্ত সাহিত্য, পদক্ষেপ ও হোমশিখা। পরবর্তী ১৫/১৬ বছর বহু লিটল ম্যাগাজিনে অজস্র লেখা ছাপা হয়েছে। দেশ পত্রিকায় লেখা ১৯৭৬ থেকে, ডাকযোগে, প্রথমে অনিয়মিত, পরে নিয়মিতভাবে। আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন দুবার। ১৯৯০-তে 'ঘুমিয়েছো, ঝাউপাতা?' কাব্যগ্রন্থের জন্য এবং ১৯৯৮-তে 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল' কাব্যোপন্যাসের জন্য। ১৯৯৭-এ পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কার, 'বজ্রবিদ্যুৎ-ভর্তি খাতা' কাব্যগ্রন্থের জন্য। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার (১৯৯৭) 'পাতার পোশাক' এবং সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (২০০০) 'পাগলী, তোমার সঙ্গে' কাব্যগ্রন্থের জন্য। আমেরিকার আইওয়া আন্তর্জাতিক লেখক শিবিরে আমন্ত্রিত হয়েছেন ২০০১ সালে।

শখ : গান শোনা, পুরনো চিঠি পড়া।

তোমাকে, আশ্চর্যময়ী

জয় গোস্বামী

প্রতিভাস

প্রতিভাস □ কলকাতা

TOMAKE, ASCHARJAMOYI
A collection of bengali poems by
Joy Goswami

কপিরাইট
জয় গোস্বামী

পরিবর্ধিত প্রতিভাস সংস্করণ
অক্টোবর ২০০৭

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ১৯৯৯

প্রকাশক
বীজেশ সাহা
প্রতিভাস
১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড
কলকাতা- ৭০০০০২
দূরভাষ : ২৫৫৭-৮৬৫৯

মুদ্রক
বইপাড়া পাবলিকেশনস্ (প্রিন্টিং বিভাগ)
১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড
কলকাতা- ৭০০০০২
দূরভাষ : ৬৫৪৪-৪৮৯৮

প্রচ্ছদ
দেবাশিস সাহা

দাম
৭০ টাকা

তোমাকে, আশ্চর্যময়ী কবি!

আমাদের প্রকাশিত কবির অন্যান্য বই

ভুতুমভগবান
এক
আলেয়া হ্রদ
ক্রীসমাস ও শীতের সনেটগুচ্ছ
প্রত্নজীব (প্রকাশিতব্য)

এই বই প্রথম প্রকাশ করেছিলেন বিজল্প থেকে প্রসূন ভৌমিক। সেই সংস্করণ থেকে এই প্রতিভাস সংস্করণে আসতে 'তোমাকে, আশ্চর্যময়ী'-র তিনটি পরিবর্তন হল। প্রথমে, শেষ প্রচ্ছদে ছাপা কবিতাটি এবার চলে এসেছে প্রথম প্রচ্ছদে। যেন একরকম ভূমিকার মতোই। দ্বিতীয়ত, আগের সংস্করণে কবিতাগুলি ১,২,৩ ইত্যাকার সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত ছিল। এবার এরা নাম যুক্ত হয়েছে। পুরোনো পাণ্ডুলিপি খুঁজে দেখে, মূল খসড়া-পৃষ্ঠায় এদের যে যে নামকরণ পরিকল্পিত হয়েছিল তখন, যথাসম্ভব সেই রকমই রাখা হল। এছাড়া, এই বইয়ের দ্বিতীয় পর্বে যুক্ত হল একটি গল্প। একই অভিজ্ঞতার তোলপাড়, লেখার ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল একদিন। অনেকটা সময় যাবার পর, আজ তাদের একই সঙ্গে ধরে দিলাম।

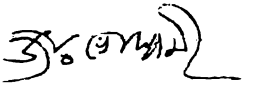

সূচিপত্র

এই যে আমার নীল ধারণা ১১
একা বজ্রে মাথাকুটে ১২
যে কান্নায় শব্দ হয় না ১৩
তুমি স্বপ্নে ১৪
ধাঁধা শোনো মূর্তিমতী ১৫
চূড়া থেকে একত্র পতন ১৬
মেয়াদ খেটেছি আমি ১৭
বোলো তারে মরিবাঁচি ভাষা ১৮
আমার যেমন খুশি আহ্বান আসেন ১৯
এ যে কী সহাস্য ২০
অনেক অস্তের মুখে ২১
বিজলি ঝলক খাব ২২
হবেও বা ২৩
আমিই সুমন ২৪
প্রণয়-গোখুর ২৫

মুকুল, মুকুল ২৬
এক বজ্রপাত থেকে ২৭
আকাশে ছুটন্ত খেলোয়াড় ২৮
ধুয়ে চলে গেছে ছন্দনাম ২৯
এসো সংকলনকর্তা ৩০
আরও বেশি পক্ষীরাজ ৩১
ছলনা সাত পা হাঁটা ৩২
একটি পুরনো বাংলা গান ৩৩
সঙ্গে ছিলে একরাস্তা পার ৩৪
তোমার মায়ের গান ৩৫
লিখিনি সম্পর্কহীনা দূর ৩৬
পরিশিষ্ট ৩৭

তুমি জানো, শ্রীজাতকিশোর? ৪১

এই যে আমার নীল ধারণা

এই যে আমার নীল ধারণা আমার নগ্নপদ
কী অসীম বালকতা ক্রিয়া শুরু করে হাবুডুবু
ওই যে মলয়ানিল উচ্চতা আমার মাথা উঁচু
তার পূর্বে ঘাস গজায়, উত্তরে-দক্ষিণে কলমিলতা
পশ্চিমে অনেক সূর্য সাশ্রু হল অস্তরাঙা মুখে
সেই যে সৈন্ধবনীল ধারণা আমার ঢেউ ছাড়া
তার নীচে সারাবেলা অভিশাপ দস্তখত করো
যার উত্তরে ধ্বংস হয়, ধ্বংস হতে হতে পুনঃপুন
অগ্নিপাত করে চলে আকাশের প্রতিষ্ঠিত তারা

একা বজ্রে মাথাকুটে

জল ও সাবানগন্ধ অন্ধ হয়ে ফেরত পেলাম
কী রূপ কী অপরূপ প্রধান মধ্যাহ্নকালে সাঁঝ
অনেক জোয়ারে চড়তে পেরেছি যখন, স্রোতে খড়
হাতে এসে বিঁধে যায় বজ্রের উপায়ে—যুদ্ধবাজ
নৌকাগণ দাঁড় দিয়ে জল পিটিয়েছে কতক্ষণ
তবু তা সুধার ধারা, শেষমেশ, ঘুরে যাওয়া ঝড়
জল ও সাবানফেনা চোখে ঢুকে দিব্যদৃষ্টি ফিরে দেয় আজ
যা তুই যা অপরূপ একা বজ্রে মাথাকুটে দিনরাত্রি গানবৃদ্ধি কর

যে কান্নায় শব্দ হয় না

পুরুষ তো লিপিকার, নারী হলে কী যে বলে তাকে!
ধরো ছাদ বলা যাক, সন্ধ্যায় মাদুরপাতা শোক
যে কান্নায় শব্দ হয় না—বুকে মুখ সেই অন্ধকার
তলায় কাষ্ঠের জিহ্বা সব জল শুকিয়ে নিঃসাড়
কী বলে তোমাকে ডাকব? খরা-ফাটা হাতে মাঠ পাতা
ধরো তরু বলা যাক, ছায়ারৌদ্রতরু নাম ধরে
তোমার শরীরে আমি দেহ পুঁতে মরেছি ক'বার
ডাল থেকে ফাঁসির দড়ি খুলে আজ ছিঁড়েকুটে ফেলে
বলা যায় ঠিক থাকো, দিন যাবে অকূলপাথার
রাত যাবে পূর্বাকাশে, আকাশের নীচে লেখা পেলে
কুড়োতে কুড়োতে তুমি পার হবে আলো অন্ধকার
তাই তো এমনভাবে বারবার প্রেমের রক্ত খেলে

তুমি স্বপ্নে

পা পুঁতে পা পুঁতে রাখা কোমর বা ঊর্ধ্বদেহ নেই
চন্দ্র আলোকিত দেশ পা-গুলি দণ্ডায়মান গোড়ালি মাটিতে
শরীর কোথায় গেল উহাদের বাকি দেহ কোথা পড়ে আছে
পা-গুলি হাঁটে না এক-পা নড়ে না এক ইঞ্চি যেন ওরা
লাইটপোস্ট বাঁশখুঁটি
দূরপ্রান্তে ট্রেন স্তব্ধ চাঁদ স্থির বাতাস নড়ছে না
ভূমি ফুঁড়ে মুণ্ডু তুলে তুমি স্বপ্নে চেয়ে আছো
প্রান্তরে গড়াচ্ছে চক্ষুদুটি

ধাঁধা শোনো মূর্তিমতী

এইবার ধাঁধা শোনো মূর্তিমতী ধাঁধাশীল ছায়া ও চন্দ্রিমা
জানালা ফাটিয়ে দাও নাকচোখহীন অন্ধ কামরায় সুজন
তেঁতুলপাতায় উঠে ঘুরে শোও সরে বোসো ঠেলাঠেলি না করো চন্দ্রিমা
মায়াবশে ভেসে চলল জাহাজ উল্টে ডুবন্ত মাল্লারা
আমার কী দোষ ছিল আমার তো দোষগুণ লাজলজ্জাগাছে
ধাঁধা-দিন যুক্ত করো, তিনচোখো ঈশ্বরী তাতে দোল দিয়ে খিলখিল হাসেন
এইটুকু ধাঁধা তার উত্তর কোথায় জলে হাত চাপড়ে খুঁজে পাও দেখি
হ্যাঁ নিশ্চয় চন্দ্রপাত না কক্ষনো নিশীথিনী নয় হাতে সুবিধা নতুন
চাঁদ পড়ে গেলে তার জ্যোৎস্নারা কোথায় দূর অট্টালিকাচূড়ে
ধাবমান ঝাঁটা চড়ে ডাকিনী চলেন ঝাঁটা আকাশের অপযশভার
ঝেড়েমুছে ফ্যালে আর তারকা ফুটিয়ে তোলে এক দুই তিন চার পাঁচ
তাই দেখে ধাঁধা বলে, এসো, বোসো, ঘরে থাকো,
ছেড়ে যাও, প্রেতাত্মা আমার

চূড়া থেকে একত্র পতন

মণিকাঞ্চনের যোগ এইমাত্র হল মণি কাঞ্চনের পায়ে
ওষ্ঠ ঘসা দিয়ে বলে কী ভাল কী ভাল অমনি কাঞ্চন দু হাতে
মণিকে পরিয়ে নেয় আপন শরীরপরে আর মণিকাঞ্চন মিলন
শুরু হয়ে যায় যত দেবী ও দেবতা আছে আকাশে পাতালে
তারা উঁকিঝুঁকি দিয়ে আলোচনা করে আহা এমন দেখিনি
দুজনে একত্রে ওঠে চূড়ায় চূড়ায় ঘটে চূড়া থেকে একত্র পতন
পুনশ্চ তখনই তারা সমুচ্চ পাহাড় বাইছে দড়ি ধরে ঝুলে পাক মেরে
ওদিকে সূর্যাস্ত হচ্ছে ওদিকে সন্ধ্যায় ডুবছে লোক সৃষ্টি লয় কতক্ষণ
মণিকাঞ্চনের যোগে আকাশ টলমল করছে কখনও দ্যাখেনি কেউ
এমন পর্বত আরোহণ

মেয়াদ খেটেছি আমি

মেয়াদ খেটেছি আমি শ্রীশ্রীডনবৈঠক মেয়াদ
ভূপৃষ্ঠে দু'হাত রেখে শ্রম পরিশ্রম ছন্দ মাটি থেকে শূন্যে ওঠা ছাদ
চাঁদের ভেলায় আমি ভাসমান কক্ষপথ ছিঁড়ে কোথা যেতে চায় চাঁদ
দু'বাহুতে মিষ্ট ব্যথা শ্রম পরিশ্রম স্কন্ধে চন্দ্রপৃষ্ঠে পদচারণার
দুষ্ট অতি দুষ্ট স্মৃতি ভুজবন্ধে কম নয় ব্যথাবাহু নিল আর্মস্ট্রং
গায়ে হাতে পায়ে গতি কোমর পায়ের ঢাল, মাটি ফাটে ধসে পড়ে ছাদ
মেয়াদ খেটেছি আমি খাট শূন্যে তুলে দিয়ে স্যার ডন বৈঠক মেয়াদ

বোলো তারে মরিবাঁচি ভাষা

আমার দুশ্চিন্তা নেই আমার দুশ্চিন্তারূপ সাতরং সাত সাত্তে

উনপঞ্চাশৎ

কাব্যটি প্রেরণ করে অপরের হাত দিয়ে যাও পাখি বোলো তারে

মরিবাঁচি ভাষা

আমার দুশ্চিন্তা নেই কহতব্য প্রাণরূপ নেই আছে দু কামরার বাসা
সপ্তরং তার মধ্যে লেপেচুবে একাক্কার মুখ মিথ্যা চক্ষুভরা রচনাটি সৎ
ধূলার বিদ্যায় বড় পারদর্শী ও কাঞ্চন দিবাকে আন্ধার করে

মণিটিকে করায় সিনান

সায়র পুষ্কর হ্রদ খিলিখিলি হাস্য করে,

চক্রবাক সারাবেলা ছোঁ মেরে হয়রান

আমার যেমন খুশি আহ্বান আসেন

আমার যখন খুশি বোধবুদ্ধি জাগে, আমি পরিধান করেছি তামাশা
আমাকে যখন খুশি ঘোড়ামুখ ডাক দেয় মা বলেছে ডাকিনী যোগিনী
ডাকিনী—ডাকার কালে, যোগিনী—যখন যুক্ত হয়
আমার বিস্মিত হাত কী ছোঁয়া পেয়েছে তাই বুঝতে আজ বেলা বহমান
আকথা কুকথা কত কান্তারে বেড়ালো তায় ধরে আনতে দু'তিনটি আকাশ
একে একে ফর্সা হয়ে আসে কোন মালগাড়ি প্রান্তরে দাঁড়ায় তার উপরে
কয়লা ধোঁয়া ঘিরে ঘিরে পাখি চক্রাকার ওগো পাখি চক্রাকার
তার ডাক শুনে কেউ ডাকিনী ভেবো না আমি পরিধান করেছি আহ্বান
তাই দেখে মা বলেছে গেল গেল যায় যায় তাই শুনে তামাশার মন
খানখান
কী আর নতুন কথা কাকপক্ষীরাও জানে আমার যখন খুশি বোধবুদ্ধি
জাগে
আমার যখন খুশি আমার যেমন খুশি আহ্বান আসেন আর যান

এ যে কী সহাস্য

এ যে কী সহাস্য কী যে হাসির ব্যাপার চৌকো গোল
লম্বা বেঁটে বাঁকা উঁচু তেকোনা গড়িয়ে যাওয়া ভাব
ভাবগত তফাৎ বা পথিক passer by যত
মত তত পথ বলে যে যার আপনাপন দিকে
স্ফুলিঙ্গের মতো ক্ষিপ্ত বহির্গত হয় লক্ষ্যে মণি
কাঞ্চন কোথায় আহা কাঞ্চন কোথায় বলে ফেরে
মণি ও কাঞ্চনে তবু ঠোকাঠুকি ঘটে যথাকালে
শিখাও নিক্ষিপ্ত হয় যে দ্যাখে সে রঙিন ধার্মিক
শয্যা নিল বিষাদের রোগে কিছুদিন, বটপাতা
মুখে আলোছায়া ফেলল, বোঝাল অনেক, তবু হায়
সেই উন্মাদনা কিছু শিখবে না তেকোনা বা গোল
চৌকো ছোটো মস্ত নীচু ধরাবাঁধা সাধনা দেখেই
মোহের ছলনে ভুলবে, বিদ্রোহী বা বিদ্রোহিনীরূপে
নিজেকে সর্বদা ভাববে, পূজা পাবে একটি দুটি, আমি সে পূজার
ছলে যে তোমাকে ভুলব তা হবে না যাদুমণি এটাই তো হাসির ব্যাপার

অনেক অস্তের মুখে

পালাও অসীমে আজ চিরবন্ধু বিহঙ্গের রাজা
তোমার রচনারীতি সাঙ্গ করো অনেক পশ্চিমে
অনেক পাখিত্বে আজ রূপ দাও বয়ঃক্রমহারা
যে যত ময়ূর যত রাজস্থান, উট, কাঁটাগাছ
যে যত দেহাত, ঘাঘরা, কাশীষাঁড়, ছুটে যাওয়া টাঙা
সে তত দু'হাত ভরে দৃশ্য পায় রাজা বিহঙ্গম
গরিব রানির মুখে আলো ফ্যালো লজ্জা ফ্যালো রাঙা
কেন না দুর্বুদ্ধি জাগলে কী হবে তা বলা তো দুষ্কর
কেন না সাফল্য বলতে তুমি দেখিয়েছ বহুবার
অনেক অস্তের মুখে ঢিল ছুঁড়ে সূর্যকাঁচ ভাঙা

বিজলি ঝলক খাব

দিন আমাকে খাতা দিন, রহস্যের কয়েক প্রকার
এই বাক্সে বন্ধ আছে, দিন আমাকে খুলে সব হিসেব উদ্ধার
করে দেখি রহস্যের কয় ভাইবোন কত বিপদ আপদ
আত্মীয় তাদের, কত বিঘ্ন বাধা পাড়া প্রতিবেশী
দিন আমাকে খাতা দিন তাদের নামঠিকানা লিখে
যাত্রা করি দুর্গমের প্রতি...আমি পাঁচ সাত প্রকার
অভিযাত্রী দেখলাম যারা শূন্য বাক্স লয়ে কাঁখে
সোনা খুঁড়তে চলে যায়, প্রাণশূন্য দেহটিকে ফেলে
জনপদে ফিরে আসে মায়ের জঠরে ঢুকবে বলে
করাঘাত করে... সেই বাক্স তবু ডালাটি খোলে না
বাক্সের উপরে লিপি, পাঠোদ্ধার করি যদি ওদের পায়ের দাগ শিখে
ধনরত্নে যাব না গো, সে আপনি যা বলুন গে আমাকে
বিজলি ঝলক খাব মাটিতে দাঁড়িয়ে আমি হা ঘরে অঙ্গার
দেব না ওদের মতো সামান্য আশায়
মণিকে কাঞ্চনমূল্য লিখে...

হবেও বা এক স্তব্ধ ঝুমঝুমি, হবেও বা এক
কুয়োভর্তি মিষ্টতর জলস্বাদ সরাইখানার
পাশে ত্যক্ত প্রাসাদের চূড়ায় প্রত্যুষগামী কাক
হবেও বা তার ডাক ক্ষুধার আহ্বানধ্বনি খা খা...
দৌড়ায় বাণিজ্য—তীরে ফেটে পড়ে গোলগোল টাকা
হবেও বা পুনরুক্ত সেইসব সদাশয় বাক্য যাতে তুমি
মাঝখান থেকে ট্যাঁড়া দাও বা সমাপ্ত না করেই
উঠে যাও গৃহছাদে যেথা ব্রাহ্মমুহূর্তের কাক
ক্ষুধাশান্তি তৃষ্ণাশান্তি ডাক ছাড়ে বেলা ক্লান্ত হলে...
হবেও বা সেই স্তব্ধ ঝুমঝুমি কণ্ঠ ভেঙে দোলানোর পরে
পতিত বায়স, তার সব ক্ষুব্ধ বাসনা উত্থান
ভানুমতী হাতখানি, মায়ামতিভ্রমবদ্ধ করবিতানের
স্পর্শ পেয়ে, পাখা ঝেড়ে, মাথা গুঁজড়ে এক কূপ জলে
সমুদয় দাঁতনখচিমটিচুমকুড়িউপাখ্যান
হবেও বা শান্ত—শুধু ত্যক্ত প্রাসাদের বইঘরে
থেকে যাবে এক গ্রন্থ ভরে তার উড়ে চলা প্রাণ...

আমিই সুমন

সুমন 'তোমাকে চাই' বলে লুঠ করে নিয়ে গেছে
তোমাকে, আমার কিছু করবার ছিল না তখন
আজ এই কাব্য নিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ালে তোমার
বিপ্লব স্পন্দিত বুকে মনে হয় আমিই সুমন

প্রণয়-গোখুর

মায়া এক, মোহ দুই, কামনা বাসনা তিন চার
চতুর্থ অহং ভাব, পঞ্চম এখানে মদে চুর
ষষ্ঠটি মাৎসর্য বুকে শুয়ে পড়ল, আমি গিয়ে তার
পায়ে দংশে সুধা খাই অদ্বিতীয় প্রণয়-গোখুর

মুকুল, মুকুল

কী সুন্দর গাছ, তাতে অন্যায়ের মুকুল ধরেছে
এত মাঠ, কেউ নেই, আছে পিছু ফিরবার তাড়া
মুকুলরা বারণ করছে : 'যেয়ো না, এমনভাবে বেঁচে
কী হবে? মাঠের নীচে মাঠ খুঁজতে বেলা হবে সারা...'

আমাদেরও হুঁশ নেই, ম ম করছে পাপবোধ, আকাশে হৈ হৈ করছে তারা
মুকুল, মুকুল ঝরছে—আমরা ছুটে যাচ্ছি তার সৌরভে শচীনে মাতোয়ারা

এক বজ্রপাত থেকে

কাল যে আগুন তুমি রেখে গেছ ঘরে
তুলে নাও তাকে, এসো, ওই জলে ঝড়ে
আমার জীবন উড়ছে দ্রুত এক বজ্রপাত থেকে
অন্য বজ্রপতনের গতিতে নেমেছি, চোখ ঢেকে
রেহাই পাইনি আমি, আজো সেই রূপে জ্বলছে চোখ
আমার সে চোখ দুটি এ চোখের মুখোমুখি হোক

আকাশে ছুটন্ত খেলোয়াড়

এই একরোখা স্বপ্ন অনন্তের হাত থেকে গড়িয়ে
ভূতলে পড়েছে, তাকে পায়ে মেরে ছুটিয়ে দে বোকা
নীচে থেকে তোকে দেখব আকাশে ছুটন্ত খেলোয়াড়
তারা ধূমকেতু বাধা পা দিয়ে কাটিয়ে এঁকেবেঁকে
আকাশকে উল্টে দিয়ে চাঁদে পা দাঁড়াবি একরোখা
সেদিন তোর হাত থেকে অনন্তই গড়িয়ে ভূতলে
নেমে খেলা দেখাবেন অপূর্ব মানবজন্ম নিয়ে
এতসব জেনে তুই চোরের উপরে রাগ করে
কেন গুমরে রয়েছিস মাটি পেতে ভাত খাবি বলে

ধুয়ে চলে গেছে ছন্দনাম

আমাদের হাতে ছিল অমূল্যভূষণ মাল্যখানি
ওঁ দয়া ওঁ মায়া ওঁ সর্বকামক্রোধবেগ
আমাদের কানে দিলে তুমি শত দুঃখের বাখানি
আমার হাত থেকে ফেলে দিলাম কলসভরা মেঘ

পায়ে পায়ে দিন গেল, ছাদে উঠে চলে গেল গান
পাখিতে পাখিতে ঝগড়া, তাই নিয়ে গড়াল দুপুর
এমন সময় এলে দরজায় মুস্কিলআসান
তখন ভিতরঘরে আমরা মারামারিতে ভরপুর

সুর লেগে চটকা ভাঙল, পাখি লেগে পুড়ে গেল বাজ
যে মালার মূল্য হয় না, তুমি বললে : দাও কেনা দাম!
আমাদের হাত কাঁপল, প্রাণ ছিঁড়ল, প্রাণরক্ত লেগে
এক সূত্র থেকে আমরা দুই দিকে ঠিকরে পড়লাম।

আকাশ আকাশই রইল, ঘটে রইল টলটলে সংসার
আর সে ঘটের জলে দমবন্ধ মরে মনস্কাম
পূর্ণ সে লেখাটি আজ পড়ে দ্যাখো কীভাবে আমার
হাতে ছন্দ থেকে গেছে, ধুয়ে চলে গেছে ছন্দনাম

এসো সংকলনকর্তা

এসো সংকলনকর্তা, হাতে ধরে মায়ার সংগ্রহ
শেখাও, অবিচলিত মোহশক্তিপাশ নাড়াচাড়া
করো আর ক্ষতবৃক্ষে ধারালো শুশ্রূষা এনে বাঁচো
ধূলা থেকে ধাবমান খোঁচা খোঁচা সম্মানফলক
ললাটচূড়ায় বিঁধে আমি যাই কিরাতের পাড়া
অমন মুকুট দেখে তাজ্জব সকলে, কিন্তু তুমি
জানো সংকলনকর্তা সে কখনো অভিযোগ কিছু না করুক
কী হতে পেরেছি আমি তার পথে মরুভূমি ছাড়া!

আরও বেশি পক্ষীরাজ

কত পরামর্শ, কত পরামর্শ, রাতগামী দিন
দিনগামী রাতভর এই করো ওই করো প্রোগ্রাম
আমার ছালায় আছে কাগজ আর কাঁচ আর লোহা আর টিন
আমার খেলনাটি আমি তা দিয়ে বানাব অ্যাই হিরের বোতাম
অ্যাইয়ো-সোনার টিকলি আমাকে ছেড়েদে ভাই মোরে ক্ষ্যামা দিন
আমার খেলনাটি হবে ঘাসের খেলনা, আমি টিটিটামটাম
মিউজিক শোনাব তাকে, হাতে ধরে বেড়ু করব, ফাঁস করব অতিছদ্মনাম
বলব, সে মেয়ের সঙ্গে হাঁটবার কালে আমি ঘাসে ঘাসে চিরশ্রেষ্ঠ দিন
আমি তো তোমারও চেয়ে আরও বেশি পক্ষীরাজ খেলনাটি হতাম

ছলনা সাত পা হাঁটা

আমার ছলনারাশি তুমি বড় গ্রহণ করেছ
ছলনা সাত পা হাঁটা, ছলনা বন্ধুত্বে পাতা হাত
ভিক্ষার আনন্দঘূর্ণি, ছলনা অকূল ফ্লাইওভার
ভিড়ে ঠাসা বাস থেকে সন্ধ্যার তলায় নেমে পড়া
আকাশে বিশ্বাসভরা চতুর্দশী, বরণের থালা
জানলায় গোধূলিকাল, মেঝেতে পারস্য উপকথা
ছলনা, ছলনা সব, উথলে ওঠা কলসও ছলনা
ছলনা ভোরের ট্রেন, তুলে দিতে এসেছিল যারা
তারাও ছলনা আজ, ছলনা সকল সন্ধ্যাতারা
সমস্ত নিয়েছ তুমি দ্বিরুক্তি না করে, হাহাকার
আজ সন্ধ্যানগরীতে অন্ধ এই কবিতাছলনা
দেব বলে দাঁড়িয়েছি সমস্ত পথের বাঁকে,
শুধু বলো একবার—নেব না!

একটি পুরনো বাংলা গান

তার কাছে ঋণ আছে একটি পুরনো বাংলা গান

উঠে যাই, ছাদে বসি, অদূরে লণ্ঠনমাত্র জ্বলে
সে বসেছে, পা গুটিয়ে, মাটিতে হাতের ভর রাখা
আমারই স্বভাবদোষে হাত ফসকে পড়ে গেল প্রাণ

আজ সব অসম্ভব। আকাশও আকাশ দিয়ে ঢাকা।
লণ্ঠন নিভেছে। শুধু দূরে ওই বাড়ির ওপারে
উঠে এল কালো চাঁদ, সেদিনের সাক্ষ্য ও প্রমাণ...

এই ছাদে গান ছিল। একটি পুরনো বাংলা গান।

সঙ্গে ছিলে একরাস্তা পার

তুমি সঙ্গে ছিলে তুমি সঙ্গে ছিলে একরাস্তা পার
এখনো রয়েছে স্মৃতি পারাপার-সমগ্র পড়ার
এক বৃক্ষ ছিল, বৃক্ষ প্রতিটি লাইটপোস্ট মানি
ট্র্যাফিকনগর নয়, ঝিঁঝি জোনাকির অরণ্যানি
পথ পিচ ঢাকা নয়, পথে বইছে স্রোত হাঁটুজল
তোমার গোড়ালি ডুবছে, আমার শরীর ছলোচ্ছল
কীভাবে যে পার হলাম, কী ভাবে যে এলাম ফেরৎ
সব জল শুকিয়েছে, হাতে শুকনো মাটি—ভবিষ্যৎ
সেই শুকনো মাটি থেকে আজ বৃক্ষ দাঁড় করালাম
তুমি ঠিক করে দাও ক্ষুদ্র এই পুস্তকের নাম

শুধু বাকি থেকে গেছে তোমার মায়ের গান শোনা...
আজ যাব—কাল যাব—হপ্তার পরের হপ্তা—যাব
বৎসর পিছনে রেখে—পৃথিবী ও সূর্যের ঘূর্ণন
আগুন ছিটকোনো চাকতি, শত শত চক্র পার করে
এসে দেখব বসে আছ, উনুনে দু'হাত, জ্বলছে
চিরন্তন যজ্ঞকাঠ, অসমাপ্ত রতি, ক্রোধ,
ধ্বকধ্বক ছন্দ সম্ভাবনা
তোমার মায়ের গান শুনতে আর কখনো যাব না।

লিখিনি সম্পর্কহীনা দূর

এক বাক্য হাতে রেখে লিখিনি সম্পর্কহীনা দূর!
আমার হাতের পাতা তুমি নিয়ে চলে গেছ, সারাবাড়ি গান গাঁথা আছে
প্রত্যেক ফলকে তার ক্ষত যত ক্ষতি যত কেটেছিঁড়ে হয়েছে মধুর
আমার পায়ের পাতা দুটি হাতে ধরেছিলে, হাতদুটি থেকে গেল কাছে
যত বাক্য লিখি সব ওই হাতে রক্ষা করি,
তাও স্রোতে সব রক্ষা ভাসান জাহ্নবী
দাঁড়িয়ে নগরতীরে আমিও ভাসিয়ে দিই
তোমাকে, আশ্চর্যময়ী কবি!

পরিশিষ্ট

আজ শান্ত হল হাত। শান্ত হল দুঃখরসাতল।
আঘাত, বিদ্রূপতির ঝরেছে সম্মান হয়ে ঘাসে
এক রৌদ্র ভ'রে দেখি তরুণ-তরুণী কবিদল
নতুন ধানের গুচ্ছ মাঠ থেকে তুলে নিয়ে আসে

আমি শস্য পার হই—জল মাটি আকাশ সম্বল...

তুমি জানো, শ্রীজাতকিশোর?

সেই একদিন আমি প্রজাপতি ছিলাম। শ্রীজাতকিশোর, আমি একদিন মথের জীবনও কাটিয়েছি। তখন আমার ডানায় ছিল কত রঙের ফুটকি। যে কোনও পাতায় গিয়ে বসতাম আমি। আমি যখন খুব ছোটো, তখন আমার সঙ্গী একটা জানলায় বসেছিল। সে বাড়ির একটা বাচ্চা ছেলে জানলাটা বন্ধ করে দেয়, এক মুহূর্তে পিষে গিয়েছিল বেচারি। সে কি আমার বোন ছিল? সে কি আমার ভাই ছিল? আমি তার নাম জানতাম না, শ্রীজাতকিশোর, আমি, তারপরও সাহস করে কত বাড়ির জানলা দিয়ে ঢুকে গেছি, বসেছি তাদের দেয়ালে। কত চুনবালি খসা দেয়াল, বাচ্চাদের পেন্সিলের আঁকিবুঁকি কাটা দেয়াল কত, দেয়ালের নীচে তাক, তাকে কাঁসা এনামেলের বাসন, বাসন তুলে রাখা, বাসন নামিয়ে রাখা হাত, আমি দেয়াল থেকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখেছি সেইসব হাতে কত দাগ, হাতের শাঁখাপলা, রোগা রোগা শিরা। যখন উনুন ধরানো হয়, ধোঁয়া লেগে দেয়াল ছেড়ে উড়ে বেরিয়ে গেছি আমি। ছোট্ট জানলা দিয়ে, রান্নাঘরের জানলা—বেঁটে, ময়লা, শিকগুলোতে যে কতদিনের মরচে, জানলার পাল্লাগুলো ফাটা, রং হয়নি কতকাল—এ সব জানলার নীচে বসে একটা মা রাঁধে, একটা মা রাগ করে—, একটা মা ছেলেমেয়েদের ধাঁই ধাঁই দেয় দুঘা। দু-তিনটে ছেলেমেয়ে কাঁদে, দু-তিনটে ছেলেমেয়ে ইস্কুলে যায়, দু-তিনটে ছেলেমেয়ে দুলে দুলে পড়া মুখস্থ করে। দু-তিনটে ছেলেমেয়ের বাবা ভোরে উঠে বেরিয়ে যায়, রাত করে ফেরে, তাদের বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো কখনও জ্বলে কখনও জ্বলে না, পাওয়ার অফিসের লোক এসে লাইন কেটে দিয়ে যায় বিল জমা হয়নি বলে। লণ্ঠন নিভিয়ে দেওয়া অন্ধকারে, মশারির চালের ওপর এসে বসি আমি। দু-তিনটে ছেলেমেয়ের বাবা, দু-তিনটি ছেলেমেয়ের মাকে টানে। মা আধো ঘুম থেকে উঠে থাপ্পড় মারে,

অশান্তির আগুনে মশারি পুড়ে যায়, সেইসব আগুনের ওপর দিয়ে আমি উড়ে বেড়িয়েছি, শ্রীজাতকিশোর, আমার ডানা থেকে দু-একটা রেণু সেইসব আগুনে ঝরেও পড়েছে। তবু কখনও অশান্তির পরের সকালে যখন রোদ ওঠে, শুকনো শুকনো ডালপালা পড়ে থাকা উঠোনটায় শালিক ডাকে কটরকট, ফুড়ুক করে একটা তুলোফুরকি পাখি শুকিয়ে যাওয়া শিউলিগাছের ডাল থেকে উড়ে পাতকুয়োর ওপর বসে। বাড়ির সামনে ছোট্ট পায়ে চলা পথটা দিয়ে বাজারে সবজি নিয়ে যায় মাথায় ঝুড়ি চাষি বউরা, তখন দরজার সামনে জল দিয়ে, ঘরে আসার সময় বারান্দার বাইরের দিককার থামে বসে থাকা আমাকে দেখে ওই ছেলেমেয়ের মা'ই বলে ওঠে—বাঃ, কী সুন্দর মথ! শ্রীজাতকিশোর, আমি কারও অশান্তি কমাতে পারতাম না, কারও আগুন আমি ঢেকে দিতে পারি না আমার ডানা দিয়ে। তবু আমি উড়ে বসেছিলাম ওই বউটির ময়লা আঁচলে, ওকে 'থাকো থাকো, শান্ত থাকো বলে', পালিয়েছিলাম : পরক্ষণেই কারণ আমাকে আঁচল থেকে ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে যদি ও আমায় ব্যথা দিয়ে বসে, ইচ্ছে করে নয়—কিন্তু দেয় যদি! কিংবা যদি ওর বাচ্চারা 'মা! তোমার আঁচলে একটা মথ বলে চেঁচামেচি লাগায়, তাড়া করে আমাকে, যদি আমার ডানা ছিঁড়ে দেয়... তাই আমি পালাই, তাই আমি পালাতাম, ওদের মায়ের চোখের সামনে দিয়ে, আর অবাক হয়ে বলত ওদের মা—'বাবা, মথটা এখানেও এসেছে!' ওর মা তো তখন চান করতে যাচ্ছে সামনের পুকুরে, ভাঙা ভাঙা ধাপ দিয়ে নামছে ঘাটে, কাঁখ থেকে কলসি রেখে বলে উঠল—'ইস এত সুন্দর মথটা, রাজু বিজু দেখতে পেল না!' রাজু বিজুকে দেখা দিতে আমার ভারী দায়! ওরা আমায় দেখলেই তো ধরতে ছুটবে, তাই আমি সবাইকে দেখা দিতাম না। আমি সবাইকে দেখা দিই

না শ্রীজাতকিশোর। সকলের অশান্তি আমি নেভাতে পারি না, শুধু তাদের কষ্টের ওপর দিয়ে একটু উড়ে যেতে পারি, যদি তাদের মন ভালো হয়, যদি তারা একবার 'বাঃ কী সুন্দর' বলে ওঠে! শ্রীজাতকিশোর। আমি রাস্তায় পড়ে থাকা রক্তের ওপর দিয়েও উড়েছি। উলটে যাওয়া ট্রাক যখন চারচাকা আকাশমুখো তুলে, চারদিকে গোল করে লোক জমিয়ে তার নিজেরই ড্রাইভারের ওপর চিত হয়ে আছে, তখন সেই ড্রাইভারের বেরিয়ে থাকা মাথার ওপর আমি ঘুরে ঘুরে উড়েছি, চিরকালের মতো তাকিয়ে থাকা চোখ দুটোর পাশের কপালে বসেও ছিলাম একবার। চোখ দুটোকে বলেছিলাম—ঘুমোও ঘুমোও, নিশ্চিন্তে ঘুমোও এ বার। আর তোমাকে সারারাত জোর করে তাকিয়ে থাকতে হবে না, আর তোমাকে ধাবায় নেমে গলা অবধি বিষপান করতে হবে না, আর আশি মাইল গতির থরথর কাঁপা স্টিয়ারিঙের ওপর তোমার শক্ত কবজিকে, আঙুলকে সতর্ক রাখতে হবে না, উলটোদিক থেকে আসা তোমারই মতো আরেকজনকে পাশ দিতে হবে না, বার বার কেউ তোমার সামনের ভরদুপুরের পিচ রাস্তায় মরীচিকা ফেলবে না, মরীচিকা তুলবে না, ছুটতে ছুটতে রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে অর্ধেক জলের মধ্যে চার চাকা তুলে উলটো হয়ে থাকা আরেকটা ট্রাককে দেখে আর শিউরে উঠতে হবে না তোমাকে।

ঘুমোও ঘুমোও বলে আমি উড়ে যাব জমা হওয়া লোক-দঙ্গলের মাথার ওপর দিয়ে। ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ হয়তো বলবে : 'কারবার দেখো এর মধ্যে আবার একটা মথ এল কোত্থেকে!' শ্রীজাতকিশোর, ওরা কেউ জানবে না আমি উঠে আসবার আগে ড্রাইভারের হিমকপালে একবার আমার মুখ ছুঁইয়ে

এসেছি। শ্রীজাতকিশোর, ওরা এও জানবে না আমি ড্রাইভারকে বারণ করে এসেছি ওর বাড়ির কথা ভাবতে, যদিও ওদের এখন খুব কষ্টে কাটবে কিছুদিন, যতদিন না ওর ছেলে ঠিকঠিক বড়ো হয়ে ওঠে, যতদিন না ওর মেয়ে একটা বর খুঁজে পায়, যতদিন না... যতদিন না... ততদিন আমি মাঝেমাঝে গিয়ে বসব ওদের বাড়ির দেয়ালে, ওদের উঠোনে কাত করে রাখা দড়ির খাটিয়ার ওপর দিয়ে উড়ে যাব গোয়ালের দিকে, গিয়ে বসব বড়ো গাইটার শিঙের ওপর, আর ওর বউ হঠাৎ দেখে ফেলবে আমাকে, তখন শিং থেকে আমি বসেছি চাঁদ—কপালে, আর গাইটার মাথা নাড়ানোতে উড়েও যাচ্ছি সামনের শিমুল গাছটার দিকে, আর বউটা তখন তার শোকতাপ অভাব অভিযোগ ভুলে কেমন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার উড়ে যাওয়ার দিকে যেন আমি শিমুল গাছের কোন পাতায় বসব তা না দেখলে ওর চলবেই না। ওই কয়েক মুহূর্তের জন্যেও তো ওর মন অন্যদিকে যাবে! ও খুশি হয়ে উঠবে, ছেলেবেলাকার খুশি! কয়েক পলকের জন্যে হলেও আমি ওই খুশি দেব তাকে, আমি না হলেও আমার মতো অন্য কেউ দেবে, অন্য কোনও মথ! শ্রীজাতকিশোর, ওরা যে দেশে থাকে ততদূরে তো আমি যেতে পারব না, অতদূর যেতে আমার ডানা ঝরে যাবে, কিন্তু ওদের বাড়ির সামনে দিয়ে নিশ্চয়ই উড়ে যাবে ওদেরই দেশের কোনও মথ; যে, আমারই মতো নিশ্চয়, দুঃখী দুঃখী সব বাড়ির মন কয়েক পলকের জন্য খুশি করে বেড়ায়। হ্যাঁ, শ্রীজাতকিশোর, বাড়িরও মন আছে। ধোঁয়ার দাগ ধরা, পলেস্তারা খসা, বহুদিন চুনকাম না করা যে সব দেয়ালে গিয়ে আমি বসি, সেইসব দেয়ালের ভেতরই থাকে বাড়ির মন। হ্যাঁ, থাকে। থাকে না, ঘুরে বেড়ায়, দেয়াল থেকে দেয়ালের ভেতরে ভেতরে ঘুরে বেড়ায় সেই মন, ধর, আমি যখন কোনও ময়লা দেয়ালের ওপর

গিয়ে বসি, তখন সেই আধভাঙা বাড়ির সকলে ঘুমে নিঃঝুম, আধভাঙা জানলা ক্যাঁচকোঁচ করছে হাওয়ায়, ময়লা মশারির ভেতর হাঁপের নিঃশ্বাস, এইসব বাড়িতে লোকে ঘুমের মধ্যেও শান্তি পায় না, সেই অশান্তির ঘুমের ভেতর থেকে উহ্ আহ্ আওয়াজ উঠে আসে। রান্নাঘরে ইঁদুরে কিছু একটা ফেলল, কিচকিচ ছুঁচো ডাকল সামনের বাগানমতো অন্ধকার জংলাটায়, আর আমি যেই গিয়ে বসলাম একটা চুনখসা বালিখসা দেয়ালের কোনায়, অমনি সেই দেয়ালের পেছন দিকে এসে বসে পড়ল বাড়ির মনও। ঠিক আমারই মতো দুদিকে ডানা ছড়িয়ে, আমরা কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু ধক ধক শুনতে পাচ্ছি,—বুকে কান পাতলে যেমন শুনতে পাওয়া যায়। বাড়ির মন আমাকে বলল, তুমি কোথা থেকে আসছ? বললাম, মন্দিরের ধারের ওই বটগাছটা চেনো তো? তারই একটা পাতা থেকে। পাতাটা হাওয়ায় ঝরে পড়ল, আর আমিও উড়তে থাকলাম। পাতাটা উড়তে উড়তে পড়ল তোমাদের বাড়ির সামনে মাটিতে। আর আমিও জানলা দিয়ে ঢুকে পড়লাম। দেয়ালের উলটোদিক থেকে বাড়ির মন বলল, কিন্তু কেন এলে, এ বাড়িতে বড় অশান্তি। আমি বললাম—হ্যাঁ সে তো হয়ই, কিন্তু তুমি নিজেকে ঠিক রাখো। দেখবে একদিন সব অশান্তি কেটে যাবে। অভাবকে অভাব বলে মনে হবে না একদিন, ততদিন তো নিজেকে ঠিক রাখতে হবে। কী করে রাখব! বাড়ির মন বলল, 'কত দিন আর নিজেকে ঠিক রাখব, কেউ তো আর আমাকে ভালোবাসে না, এ বাড়ির কেউ'—কী করে জানলে, ভালোবাসে না? আমি বলি। বাড়ির মন বলে, 'কখন আর ভালোবাসবে, সারাক্ষণ নিজেদের শাপমন্যি করছে, কেউ ঘটিবাটি ছুড়ে মারছে, কেউ গায়ে আগুন ধরাতে যাচ্ছে, কেউ গলায় দেবার জন্যে দড়ি খুঁজছে সারাজীবন...

আমাকে ভালোবাসার সময় কোথায় ওদের? ওরা নিজেদেরই ভালোবাসে না। আমি বলি, আচ্ছা বেশ, বাড়ি, তুমি রাগ কোরো না, তুমি খারাপ থাকলে তো সবার কষ্ট। —না, কারও কষ্ট নয়, কেউ তো আমায় ভালোবাসে না, বললাম না। আমি তোমায় ভালোবাসব বাড়ি। আমি তোমায় খুব ভালোবাসব। বাড়ির মন অবাক!—তুমি! তুমি ভালোবাসবে আমাকে?—হ্যাঁ আমি। কেন, আমাকে পছন্দ নয় তোমার? বাড়ির মন আকুল হল।—তুমি, সবুজ মথ! তোমাকে পছন্দ না হয়ে পারে! এ তো আমি ভাবতেও পারিনি।

—কী ভাবতে পারনি তুমি?

—এই যে তুমি ভালোবাসবে আমাকে। তার মানে তুমি আজ থেকে থাকবে তো আমার কাছে?—না বাড়ি, আমি থাকব না। আমি থাকব তো বলিনি। বাড়ির মন যেন ভেঙে পড়ে— সে কী, থাকবে না! তবে ভালোবাসবে বললে যে! —হ্যাঁ, বাসব তো, আজ রাত্তিরের মতো ভালোবাসব, আজীবন যত ভালোবাসা তোমার বাকি আছে, এই এক রাত্রে তা পূর্ণ করে দেব আমি। বাড়ির মন বলে,—আর তারপর? কাল সকালে বুঝি উড়ে যাবে?—হ্যাঁ যাব। ওই জানলাটা দিয়ে। ক্যাঁচকোঁচ করা ওই ভাঙা জানলাটা?—হ্যাঁ, ওটা দিয়েই তো এসেছিলাম, ওটা দিয়েই যাব। বাড়ির মন বলে,—তারপর থেকে আমি ওই জানলাটার দিকে আর তাকাব কী করে? যতদিন না মিস্তিরিরা এসে আমাকে আবার ভেঙে ফেলছে ততদিন তো ওই জানলাটা নিয়ে আমাকে থাকতে হবে। আমার নিজেরই একটা জানলার দিকে আমি তাকাতে পারব না!

—পারবে না কেন, যখন ভাববে ওই জানলা দিয়েই আমি ঢুকেছিলাম, এসে বসেছিলাম তোমার দেয়ালে, তখন আর জানলাটাকে অত অসহ্য মনে হবে না তোমার। তা ছাড়া আর কখনও আসব না, তাও তো বলিনি। আবার হয়তো ওই জানলাটা দিয়েই, কিংবা ফাটল ধরা ওই দরজাটা, কিংবা রান্নাঘরের ঘুলঘুলি—যে কোনও দিক দিয়েই তো আমি আসতে পারি। আবার আসব না তো বলিনি।—আবার আসবে তুমি! আশ্চর্য, আমি তো এখনও চলে যাইনি, আবার আসার কথা তো পরে। তার আগে তো এই রাতটা রয়েছে। আমাদের হাতের সামনের এই রাত! ভালোবাসার জন্যে।—ও বলল, কিন্তু আমরা তো কেউ কাউকে দেখতে পাই না, আমরা তো দেয়ালের এপিঠে ওপিঠে। কী করে আমি তোমাকে ছোঁব! আমি বললাম, বালি, সিমেন্ট, ইট, চুন গলে যাক, ব্যবধান গলে যাক। তুমি মনে মনে বলো, তোমাকে ছোঁব। দেয়ালের উলটোপিঠে ধক ধক বেড়ে উঠল। আমিও বলতে লাগলাম—এসো, তোমাকে ছুঁই, এসো। আর আমাদের মধ্যের দেয়াল মিলিয়ে গেল রাত্রির ভেতরে। আমি তাকে পেলাম, সে আমাকে দিল—যত ভালোবাসা সে অন্যদের দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে আজীবন, সব সে দিল আমাকে।

সকাল হওয়ার আগে যখন আমি তাকে ছেড়ে এলাম, বাড়ির অন্য সবার সঙ্গে সেও তখন আচ্ছন্ন ভোরবেলার ঘুমে, কী আশ্চর্য! এতদিন বাড়ির সবাই যখন ঘুমোত, জেগে থাকত শুধু বাড়ির মন। আজ সেও ঘুমে। তারপর সকাল হল, আর অতদিনের ভাঙা বাড়িটাকে রোদ পড়ে কী সুন্দর দেখাতে লাগল! ক্যাঁচকোঁচ করা ফাটা জানলাটায় সকালের রোদ্দুর লাগল। ভাঙা দরজার মধ্যে দিয়ে ঢুকল দুটো তিনটে সাহসী চড়াই। বাড়ির

লোকেরা সকালের চা-বিস্কুট থেকে ভেঙে বাসি রুটির প্রাতরাশ থেকে ছিঁড়ে বারান্দায় টপকে দিল। চড়াইরা ভয়ে পিছু হটল প্রথমে, আবার ভাঙা থামের ওপর দিয়ে উড়ে এসে ঠোঁটে তুলে নিয়ে পালাল তাদের জলখাবার। সে দিন থেকে ওই বাড়িতে ভালো খবর আসতে শুরু করল। সে বাড়ির লোকেরা পরস্পরকে শাপমন্যি করার বদলে 'জানিস তো জানিস তো' করে গল্প শুরু করল অকারণে। সে বাড়ির পুরুষলোক তার চরম অসুখি বউকে বলল, 'রমা টকিজে একটা ভালো বই এসেছে।' ছেলেমেয়েরা তাদের বাবার হাতে মার খেল না, মায়ের কাছে বকা খেল না। তাদের একজন খুব ভালো রেজাল্ট করল, অন্যজন টায়েটোয়ে পাশ করে গেলেও তাদের দাদুর হাঁপের টান কোবরেজের ওষুধে হঠাৎ আশ্চর্যভাবে ভালো হয়ে গেল, সেরে গেল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল 'ভগবান আছেন'। অসুখী বউটি তার আজন্ম অপদার্থ স্বামীর বুকে মাথা রেখে দু-চার ফোঁটা চোখের জল ফেলল। বলল, অনেক গঞ্জনা দিই তোমাকে। মাথার ঠিক থাকে না। তুমি দোষ নিও না গো। স্বামী তো অপদার্থই, সে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, সে এ সব শুনতেই পেল না। আর বাইরে বৃষ্টি নামল। আমি ডানা বাঁচাবার জন্যে বটগাছের একটা পাতা থেকে আরেকটা নিরাপদ পাতায় সরে যেতে যেতে দেখলাম বৃষ্টির শব্দে বাড়ির মনের ঘুম ভাঙল। সে উড়ে গেল, উড়ে গিয়ে বসল জানলায়। তার গায়ে ছাঁট লাগছে, তার ডানা ভিজে যাচ্ছে, কিন্তু তার হুঁশ নেই। আমি জানি, আমার মতোই তার ডানা ভিজলে কোনও ক্ষতি হবে না তার। কেননা সে এখন ভরে আছে। মন ভালো থাকলে ভেজা ডানার কোনও ক্ষতি হয় না। সে তাকিয়ে আছে গত রাত্রে যে হাওয়া ধরে আমি উড়ে গিয়েছিলাম, উঠোনের ওপরকার যে শূন্যতা ধরে, সেই অদৃশ্যরেখার দিকে তাকিয়ে আছে

সে। সে জানতেও পারছে না এই বটগাছের পাতার আড়াল থেকে আমিও চেয়ে আছি তার দিকেই। আমি চোখ দিয়ে তাকে ভালোবাসছি, বলছি ভালো থাকো, ভালো থাকো বাড়ির মন, তুমি ভালো থাকলেই তো বাড়ির সবাই ভালো থাকবে। তোমার বাড়ির উঠোনে যে অযত্নের গন্ধরাজ, সে ভালো থাকবে। তার সাদা পাপড়ির ওপর গত রাত্রের ওই একটা-দুটো বৃষ্টিবিন্দু ভালো থাকবে। সকালের রোদে হাসতে হাসতে উবে যাবে তারা, একটুও দুঃখ করবে না। যে কামিনীঝোপ পাতা ঝামরে মুখ গুঁজে পড়ে থাকত এতদিন হঠাৎ সে একদিন তার লুকোনো কুঁড়ি দেখতে পেল, আর তোমাদের বাড়ির সেই সদ্য বড়ো হয়ে ওঠা মেয়েটা পড়ালেখা করতে করতে খাতার ওপর গাল রেখে শুয়ে পড়বে। তখন কি মনে পড়বে তার? তুমি ওর মনও ভাল করে দিও বাড়ির মন। আমার এত কথা বাড়ির মন শুনতে পাবে না। কিন্তু কথাগুলো হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে গিয়ে আদর করবে তাকে। বাড়ির মন সে দিন আর দেয়ালের পিছনে ফিরে যাবে না। ভাঙা ছাদের ওপরটায় গিয়ে সারারাত বৃষ্টি পড়া দেখবে, বৃষ্টির পর রোদ ওঠা দেখবে। বাড়ির মন সে দিন উড়ে বেড়াবে সারা বাড়ি। কিন্তু বাড়ির লোকেরা তাকে দেখতে পাবে না। তেমনই বাড়ির মনও দেখতে পাবে না যে, আমি সামনের বটগাছের পাতা থেকে উড়তে উড়তে চললাম অন্য কোনও দেশে। দেশ মানে গাঁ, গাঁ মানে ঘরবসত, লোকজন, ঝগড়াঝাঁটি, হাসিমশকরা, দোকনপাটের পর দোকানপাট, জল আনতে যাওয়া মেয়ে, ভট্‌ভট্, শ্যালো পাম্প, হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত লেখা সাইনবোর্ড, চাটাই ঘেরা, শতরঞ্চি পাতা সরমা সিনেমা, আর বৃষ্টিতে চড়চড় আওয়াজ করা টিনের চালার প্রাথমিক বিদ্যালয়, আর এ পাশে সবসময়ের একটা নদী, সেই নদী আমি কতবার এপার ওপার

করেছি, শ্রীজাতকিশোর আমি উড়ে উড়ে দেখেছি ধক ধক জলকাটা স্টিমার, ছপছপ জলকাটা খেয়ানৌকো আর মস্ত মাঠের ওপর মেঘ করে আসা। মেঘ সরে যাওয়াও আমি দেখেছি। আর শ্রীজাতকিশোর, ঠিক এই সময় আমি দেখলাম—সে। তাকে দেখেই আমার মানুষ হতে ইচ্ছে করল। ভগবানকে বললাম—ভগবান, তুমি আমাকে মানুষের শরীর দাও, আমি ওর পাশেপাশে খানিকক্ষণ হাঁটি। গাছের দিকে তাকিয়ে আমি ভগবানকে বললাম, একপুকুর জলের দিকে তাকিয়ে বললাম, সারামাঠে যে ধান গোলায় ওঠার জন্য দুলছে তাকে বললাম আর তাকে দোলাচ্ছে যে হাওয়া সেই হাওয়াকেও বলতে ছাড়লাম না। সবাইকে বললাম, আমাকে মানুষ করে দাও, ওর পাশেপাশে হাঁটি। এই মথের জীবন আর একমুহূর্ত সহ্য হচ্ছে না আমার। ধানের ভগবান আমাকে বলল, গাছপুকুর বাতাসের ভগবান সবাই মিলে আমাকে বলল—কিন্তু ওর পাশে তো তোমাকে মানাবে না। তুমি তো অনেক দিন ধরে মথ হয়ে আছ। তুমি তো কয়েক জন্মের মথ। এখন তোমাকে মানুষ করে দিলে তুমি তো ওর পাশে বুড়ো। তুমি ওর পাশেপাশে হাঁটলে ও কি তোমার দিকে ফিরেও দেখবে? আমি বললাম, না দেখুক, তবু দাও। শ্রীজাতকিশোর, তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ—কী এমন দেখতে তাকে! এমন কী রাত জাগানো রূপ? নিশ্চয়ই ভাবছ তুমি। আসলে তা না জানো, তা না। তাকে কেমন দেখতে বলব? মহেঞ্জোদরোর তলা থেকে তোলা একটা ভাঙা নারীমূর্তির মতো দেখতে সে। তেমনই লম্বা লম্বা হাতে মোটা মাটির গয়না, একটা কান ভাঙা, কপালে ফাটল, গায়ে ধুলোবালি। তুলে আনবার সময় খনকের শাবল লেগে পিঠের একটু পাথর উঠে গেছে। কিন্তু সে মূর্তি নয়, তার প্রাণ আছে। সে হেঁটে হেঁটে ঘুরে বেড়ায়, সে জলের ধারে বসে থাকে। জল মানে,

সমুদ্র। আবার এক সমুদ্র থেকে আরেক সমুদ্রের ধারে সে হাঁটে। আমি আবার বললাম, আমি ওর সঙ্গে হাঁটব। তুমি আমাকে মানুষ করে দাও, ঠাকুর! তারপর ঠাকুর তো একদিন আমায় মানুষ করে দিল। আমি হাঁটছি ওর পাশেপাশে, পেছন পেছন, ওর চেয়ে আমার বয়স অনেক বেশি তো, তাই গতি অনেক কম। ও কী করে জানো? পাহাড়ের পাশে দাঁড়িয়ে ছেনি বাটালি দিয়ে পাথর কেটে নাক মুখ চোখ বানায়। ছোট্ট ছোট্ট মানুষ, হরিণ, পাখি। মানুষ চলতে চলতে স্থির হয়ে যায় পাথরের মধ্যে, চিল চিরকালের জন্য বাঁক নেয়, অস্ত্র চিরকালের জন্য উদ্যত হয়ে থাকে প্রাণ নেবে বলে। আহত ও অ-নিরাপদ পশু আর মানুষ নিঃশব্দ চিৎকার করে গুহাগাত্রে। সেই গুহায় সে ঘুমোয়, বাইরে পাহারায় থাকি আমি। পরদিন সে উঠে আবার চলে। নতুন পাহাড়, নতুন গুহা, নতুন সমুদ্রতীরের খোঁজে। পেছন পেছন চলি আমি। সে মাঝে মাঝে আমাকে তার ছেনিবাটালি ধরতে দেয়, স্নান করতে নামলে তার যৎসামান্য পোশাক ধরতে দেয়, স্নান করে উঠে বলে—খাবার কোথায়? আমি কাঠকুটো জড়ো করে রান্না করি। দেশে দেশে কুটির তৈরি করি, রাতে তার অস্থিরতা এলে সে আমাকে ডেকে নেয় দাওয়া থেকে। একবার, দুবার, তিনবার আমি শান্ত করে আসি তাকে। তার নতুন খেয়াল এসেছে মাথায়। সে বালির ওপর হাতের তেলো দিয়ে চেপেচেপে তৈরি করছে মুখ, পাখি, প্রাসাদ। আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকি, সে জিজ্ঞেস করে—কেমন হয়েছে বলো তো? ঠিক আছে? আমি বলি—হ্যাঁ। তার শিল্পের খুঁত ধরে দিই আমি, গুণ খুঁজে আনি আমি। কোনও সমুদ্রও তার বেশিদিন ভালো লাগে না, কোনও গাছ, কোনও পাহাড় তার বেশিদিন ভালো লাগে না। আর মানুষ! মানুষকে তো সে পরিহার করেই এসেছে বরাবর। এত হাজার বছর ধরে সে তো কোনও

মানুষের সঙ্গে থাকতে পারল না। সে মাঝেমাঝে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, পোশাক ছুড়ে ফেলে দেয় সমুদ্রে, মাটিতে আছড়ে ভেঙে ফ্যালে মাটিরই গয়না। মাথা ঠোকে গাছের গায়ে, বলে—আমাকে মাটির তলার স্নানাগারে ফিরিয়ে দাও আবার, আমার ওপর ধস নামাও। মাটির স্তূপের নীচে চাপা দিয়ে রাখো আমাকে, যাতে আমার সংজ্ঞা চলে যায়, যতক্ষণ জ্ঞান থাকবে ততক্ষণ কষ্ট পাব আমি। আমার ভালো লাগছে না, আমার কিছু ভালো লাগছে না, আমি জলে ঝাঁপিয়ে সমুদ্র থেকে তার ভেসে যাওয়া পোশাক এনে দিই। সেগুলো আর পরা যায় না। আমি গাছের ছাল থেকে আবার পোশাক তৈরি করতে শিখি। মাটি থেকে আবার তৈরি করি মৃৎপাত্র, মাটির অলংকার। আমি আবার কুটির বানাতে শিখি, কাঠকুটো কুড়িয়ে কীভাবে রান্না করতে হয়, কাঁচা মাংসকে সুস্বাদু করতে হয় কীভাবে আবার সে সব শিখি। আর এতে আবার আমার বয়স বেড়ে যায় হাজার বছর। আরও বুড়ো হয়ে যাই আমি। সে শান্ত হয় ক্ষিপ্ত হয়, শান্ত হয়। তার ভাঙাভাঙা হাত-পা আমি নতুন করে তৈরি করে দিই আবার। গুহায় গুহায় গিয়ে আবার খুঁজে বার করি তার শিল্পকাজ, সভ্যতাকে বলি—এই দ্যাখো। দেখামাত্র পুরো সভ্যতা খুঁজতে শুরু করে তাকে। জাহাজ চেপে লোক আসে, উড়োজাহাজ চেপে লোক আসে। টুপি, চশমা, আতসকাচ, আর ছবি তোলার যন্ত্রপাতি হইহই করে এসে পড়ে, সে আবার খেপে যায়। বলে—আমার কিছু ভালো লাগে না। সে আবার তার হাতের ছেনিবাটালি ছুড়ে দেয় গভীর জলে, তুলি ছুড়ে মারে গ্যালারি ভর্তি লোকজনের মধ্যে। ক্রিটিকের চশমা সে পা দিয়ে মাড়িয়ে ভাঙে, ক্রিটিকের ছেলের বুকের ওপর গিয়ে শুয়ে পড়ে এবং রাত শেষ হতেই তাকে ভোম্বল অবস্থায় ফেলে আসে। আমি জলের তলা থেকে তার ছেনিবাটালি খুঁজে নিয়ে,

কাঁধের ঝোলায় তার ব্রাশ আর রঙের টিউব ভরে নিয়ে, পিঠের ওপর ক্যানভাস চাপিয়ে আবার তার কাছে যাই; বলি—শান্ত হও। মন স্থির করো। মনকে হাতের ফাঁক দিয়ে মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে যেতে দিও না। সে বলে, পাজি বুড়ো। আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যা। সেই কবে থেকে, কত হাজার বছর আগে থেকে তুমি আমার পিছু নিয়েছ। আমি আর তোমাকে দেখতে চাই না। তুমি দূর হও। বলে, সে তার মন ছুড়ে মারে আমার মুখের ওপর। কত পাথর, কত উল্কা, কত ধস তো আমার ওপর পড়েছে, আর ওই মনটাও এসে পড়ে। আর আমি যা ভয় করেছিলাম তাই ঘটে। মন হারিয়ে ফেলে সে অন্ধকার হয়ে যায়। এই অবস্থায় তাকে একা রাখা ঠিক না। আমি লোকচক্ষু থেকে তাকে সরিয়ে ফেলি।

আবার তাকে গুহা আর সমুদ্রতীরের কাছে নিয়ে যাই। শুইয়ে রাখি জলের ধারে। তার মন কিন্তু আমার কাছে গচ্ছিত থাকে। তার শরীর পড়ে থাকে জলের ধারে, নিস্পন্দ। তার মনকে আমি যত্ন করে লুকিয়ে রাখি আমার শরীরের ভেতর। যখন ও সেরে উঠবে, ওর মন ফিরিয়ে দেব ওকে। ওর মনকে আমি জিজ্ঞেস করি— কী চাও মন! কী চাও? এত অশান্ত কেন? নিজেকে নষ্ট করে ফেলতে চাও কেন? কেন তুমি শান্তি পাও না? সে বলে, আকাশের ওই সূর্যটাকে আমার পছন্দ নয়। আমি বলি, কী করতে চাও, তাতে?—আমি ওইটার বদলে আরেকটা সূর্য তৈরি করতে চাই। আমার মনের মতো সূর্য। এই পৃথিবীর পাহাড়গুলো আমার পছন্দ নয়। আমি নতুন নতুন পর্বত গাঁথতে চাই। আমার ছেনিবাটালিগুলো কোনও কম্মের নয়। ওরা কিচ্ছু পারে না। এই সমুদ্রের রংটা আমার পছন্দ নয়। নীল কেন হবে! আমি অন্য রং

দিতে চাই, আমার রং। আমি বলি—কী রং? মন! কী রং? মন ভেঙে পড়ে, বলে—আমি জানি না, সত্যি জানি না। আমি এখনও খুঁজে পাইনি কী রং। সে জন্যেই তো এত অসহায় লাগে। তুমি কিচ্ছু পারো না, তুমি বলতেই পারো না কী রং সেটা! কী রং...বলতে বলতে মন খানখান হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। আমি একটা একটা করে তার টুকরোগুলো জড়ো করতে থাকি। কোনওটা পাওয়া যায় মিশরে, কোনওটা উত্তর মেরুর বরফের নীচে, কোনওটা থর মরুভূমির দুপুরের উড়ন্ত বালি থেকে মুঠো করে ধরে আনতে হয়। কোনও অংশটা চাপা পড়ে থাকে ইহুদিদের গণকবরের নীচে। সাদা হাড়গোড়ের ভেতর থেকে বহু কষ্টে তাকে চিনে বার করতে হয়। সারা পৃথিবী থেকে তার ছড়িয়ে পড়া মন একটু একটু করে জড়ো করে আমি অঞ্জলি ভরে ঢেলে দিলাম তার ঘুমন্ত শরীরে। সে ধীরে ধীরে উঠে বসল। এমনভাবে তাকাল সে আমার দিকে যেন তার কোনও স্মৃতি নেই। যেন সে প্রথম দেখছে আমাকে। তাকিয়েই রইল, তারপর বলল সেই কথা, যা সে এতদিন কখনও বলেনি। বলল,—কী সুন্দর! কী সুন্দর তুমি! তুমি কী করে এমন সুন্দর হলে! সে আর চোখ ফেরাল না আমার দিক থেকে।—আমি। সুন্দর!...আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। এতদিনে তো আরও পাঁচ হাজার বছর বয়স বেড়েছে আমার! আমার সামনে আরও দুবার ধ্বংস হয়ে গেছে পৃথিবী। আমার পিঠের পেশি এতদিনে পাথর হয়ে গেছে, আমার হাত পা শিলায় তৈরি। দুবার ধ্বংসের পরেও বেঁচে গিয়েছিল যে গাছ, আমার চুলগুলো এখন তার শেকড়। আমার মুখের ওপর কত লম্বা-লম্বা দাগ, শুকিয়ে যাওয়া ঝর্নার দাগ, বুকের ওপর ঘাসের চাবড়া...পাথর ফাটিয়ে ওরা জন্মেছে। সে আমার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারল না কতদিন, কতদিন? তা হাজার বছর হবে!

তারপর সে এগিয়ে এসে ধরল আমার হাত। অত ভারী হাত আমার! কিন্তু সে হালকা খেলনার মতো তুলে নিয়ে চেপে ধরল তার ঠোঁটে। আলাদা আলাদা করে প্রত্যেকটা আঙুল সে ঠোঁটের মধ্যে নিয়ে জিভে ছোঁয়াল, বলল—উম্‌ম, আমি এদের চিনি...এটা লোহা, এটা ম্যাঙ্গানিজ, এটা তামা, এটা সোনা, অভ্র...অভ্র এটা হুম্‌ম্‌ আমি এদের স্বাদ চিনি! এরা একই রকম আছে!—কী আশ্চর্য! একই রকম মানে! তা হলে ওর কি স্মৃতি আছে! কিন্তু ওর দৃষ্টি তো স্মৃতিহীন! আমি তার কাঁধে হাত রেখে বলি—শান্ত হও। সে আমার কথা শুনতে পায় না। কিন্তু আমার স্পর্শমাত্র সে বিদ্যুতে রূপান্তরিত হয় এবং পরক্ষণে আগের চেহারায় ফিরে আসে। আমার হাত ঝনঝন করে। দাড়িগোঁফের জঙ্গল থেকে আঙুল দিয়ে সে খুঁজে বার করে আমার ঠোঁট। ধীরে ধীরে আঙুল বোলায়। বলে,—এরাও কি পাথর? বলো, বলো! পাথর কি এরা! আর আমার ঠোঁটের পাথরে ধীরে ধীরে মাটি সঞ্চার হয়। সে আঙুল রাখে আমার বুকে। তার হাত ভেসে বেড়ায়। সে বলে,—কত সব পুরনো নদীখাত! এরা কী করে শুকিয়ে গেল? সে ঠোঁট রাখে এই শুকিয়ে যাওয়া নদীখাতগুলোয়। বলে,—জল আসুক। আমার তেষ্টা পেয়েছে। বুকের ওপরকার ঘাসের চাপড়ায় সে মুখ ঘষে আর খেলে বেড়ায়। এমন সেই খেলা, যাতে পাথরও শিউরে ওঠে। আর সে খুঁজে বেড়ায়, বলে, কোথায়! কোথায় তোমার প্রাণ! আমি দেখব। কত হাজার হাজার ফুট নীচে তাকে রেখেছ? মাটি, শিলা, জল, কয়লা সব সরিয়ে আমি পৌঁছব সেখানে। তোমার শেষ বাধা সেই চলমান প্লেটগুলোকেও আমি সরিয়ে ফেলব আমার ঠোঁট দিয়ে। বলো কোথায় তোমার প্রাণ! কোথায়, কোথায়! বলতে বলতে সে কোন পাতালে পৌঁছে ওষ্ঠের মধ্যে চেপে ধরে আমার প্রাণ। আমি চুপ করে থাকতে পারি না।

বলি, —ঈশ্বর! আমি আর পারছি না। আমায় রক্ষা করো। আর আমার জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়।

জ্ঞান যখন ফিরল, তখন সে সমুদ্রের ধারে বসে, বালি নিয়ে তার খেলায় মেতেছে। মুখ, প্রাসাদ, আর বালির গাছপালাই সে বানায়নি, তার পাশে সে বালি দিয়ে তৈরি করছে একটা মথ। আমি তাকে কাতর হয়ে বললাম—একে তৈরি কোরো না, না, একে নয়। শোনো, তুমি আমার কথা শোনো। সে আমার দিকে ফিরেও তাকাল না। দু হাত দিয়ে সে বালির মথের বালির ডানা তৈরি করে চলল। আমি আমার ক্লান্ত অশক্ত শরীর নিয়ে তাকে অনুনয় করলাম আবার,—শোনো, এমন কোরো না, সে আমার দিকে তাকাল না। আমি জানি এবার সে কী করবে। হ্যাঁ আমি জানি,—তা হতে দেওয়া যায় না। ওই তো! ওই তো সে তাই করছে। হ্যাঁ, সে নিজে হাতে তৈরি করা বালির মথটার ওপর ফুঁ দিচ্ছে। আর বালি উড়ে যাচ্ছে মথের গা থেকে। আমি বললাম,—আমি তো তোমাকে সমস্ত দিয়েছি, সমস্ত! আমি তো বললাম তুমি ওকে তৈরি কোরো না। কারণ তৈরি করলেই তোমার ওকে ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করবে। সে বলল,—আমার ইচ্ছে আমি তৈরি করব। আমার ইচ্ছে, আমি ভেঙে ফেলব। আমি বললাম—শোনো, আমি তো তোমার কোনও ক্ষতি করিনি। তুমি আমার কথা শোনো। সে বলল,—আমার ক্ষতি হয়েছে। আমি বললাম,— সে আমার দুর্ভাগ্য; আমি তোমাকে কেবল দুর্যোগ থেকে আগলে রাখতে চেয়েছিলাম। আমি কেবল তোমার হাতে ছেনি, বাটালি আর রং-তুলি এগিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। সে বলে,—ওরা তো আমার হাতেই ছিল, তুমি এগিয়ে দেবে কি।—হ্যাঁ। ছিল, কিন্তু তারা যাতে খসে না যায়, তারা যেন হারিয়ে না

যায় তোমার থেকে, আমি কেবল এইটুকুই চেয়েছিলাম। তারা যখন খসে গিয়েছিল, আমি তাদের খুঁজে এনেছিলাম।— কেন! কেন চেয়েছিলাম! সে বলে, আমি তো তোমাকে তা চাইতে বলিনি? কেন তুমি হাত দেবে আমার স্বাধীনতায়? আমার ইচ্ছে হলে ছেনিবাটালি ধরব, আমার ইচ্ছে হলে আমি ছুড়ে ফেলব তাদের। আমার বেঁচে থাকাটা আমার, তোমার নয়। আমি কী জানি না ভেবেছ! তোমার সব কথা জানি আমি। আমি কাতর হয়ে বলি,—কী! কী জান তুমি? সে বলে,—আমি জানি সেই কথা তুমি কখনও আমাকে বলনি।—কী, কী কথা আমি বলিনি তোমাকে! সে এতক্ষণ পরে আমার দিকে তাকায়। আমি দেখি তার মুখ কাছ থেকে দেখা চাঁদের মতো। তাতে বড়ো বড়ো উল্কাক্ষত, তাতে লম্বা লম্বা শুকিয়ে যাওয়া সমুদ্র, তার চোখ থেকে বালি উড়ছে, সেখানে কোনও জল নেই। সে বলে,—আমি জানি, তুমি কেবল আমাকে দেখেই একদিন পতঙ্গ থেকে মানুষ হতে চেয়েছিলে, কেবল আমাকে দেখে। আমি যদি না থাকতাম, তা হলে চিরকাল পতঙ্গ হয়ে থাকতে হত তোমাকে, মানুষ হওয়ার ইচ্ছেটুকুও আসত না তোমার মধ্যে। আমি জানি এ মানবশরীর পাওয়ার পর কেন তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছ। কান্নায় আমার গলা ভেঙে যায়, মাথা ঝুঁকে পড়ে বুকের ওপর। আমি শুধু বলি— কেন, বলো, কেন? সে বলে,— যে কেবল আমি একদিন তোমার বুকের ওপর উঠে খেলা করব বলে। তোমার প্রাণকে মুঠোয় ধরব বলে। আমি বলি,—না, তা নয়। আমি শুধু চেয়েছিলাম তুমি হও, তুমি হও, তুমি হয়ে ওঠো, সমস্ত সভ্যতা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে।—আমার দিকে?—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার দিকে। কারণ, শিল্প ছাড়া যে এ সভ্যতা বাঁচবে না। তুমি এই মথকে উড়িয়ে দিও না। সে আমার দিকে থেকে মুখ ফিরিয়ে

নিল। হাঁটু গেড়ে বসে গাল রাখল বালির ওপর। ফুৎকার দেওয়ার জন্য মুখ গোল করল চুম্বনের মতো। আমি হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেলাম তার দিকে.—কোরো না, থামো, থামো তুমি। তার হাত আঁকড়ে তাকে টানলাম। কিন্তু আমার সমস্ত আমি তাকে দিয়ে দিয়েছি, আর কোনও শক্তি আমার নেই। আমার শরীর গড়াতে লাগল বালির ওপর। সে একবার ফুৎকার দিল। বালি উড়ে গেল। আমি শেষ শক্তি নিয়ে বালির ওপর গড়িয়ে তার মাথার ওপর হাত রাখলাম। মাথা সরিয়ে দিতে চাইলাম যাতে তার ফুৎকার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। মাথা ছাড়িয়ে নিয়ে সে বলল,—তুমি আমাকে ছোঁবে না। এত হাজার বছর পর সে প্রথম বলল,—না, তুমি ছোঁবে না আমাকে। আমি দু' হাতের মধ্যে তার মুখ ধরলাম। আর সে ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। আর গড়িয়ে পড়ল বালি আর সমুদ্রের বিভাজনরেখায়। সে শুধু চিৎকার করে বলতে থাকল,—না! না! না!

আর সঙ্গে সঙ্গে সেই সর্বনাশ ঘটল। তার আর্ত 'না!' চিৎকার সোজা উঠে গেল সমুদ্রতীর থেকে আকাশে, আর ফাটিয়ে ফেলল মেঘ। আর বজ্রপাত হল সরাসরি তার মাথায়। কয়েক মুহূর্তে সে শরীর থেকে অঙ্গার, অঙ্গার থেকে ভস্মে পরিণত হল। আর সে ভস্ম ধুয়ে নেমে গেল সমুদ্র। তুফান উঠে এল সমুদ্র থেকে। সহস্র ফুৎকারের বেশি তেজ তার। বালির মথ বালির ঘূর্ণিঝড় হয়ে উড়ে চলল দিকদিগন্তে। সেই ঝড় মানুষ থেকে উড়ন্ত বালি করে দিল আমাকেও। তার একটা কণার সঙ্গে আর একটা কণার আর কোনও সম্পর্কই রইল না।

শ্রীজাতকিশোর, তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ এ সব গল্প কেন আমি তোমায় বলছি! আর কী করেই বা এর মধ্যে তুমি এলে। কী করেই

বা এল তোমাদের ওই পাড়া! আসলে কী হয়েছে জানো! ওই যে দিগন্তে ছুটে গিয়েছিল বালিঝড়। তার একটি দিগন্তের নীচে ছিল তোমাদের এই পাড়া। আর ওই বালিঝড় থেকে একটি বালির কণা এসে পড়েছিল তোমাদের এই কলেজের মাঠের পেছনে। তারপর যা হয়। একটা কাক ডিমের খোলা মুখে করে এনে ফেলল তার ওপর, একটা সাইকেলের চাকা তাকে আরেকটুখানি বসিয়ে ফেলল মাটিতে। আরেকটা পাখি এসে তার ওপর একটু নতুন মাটি ফেলল. সামনের বটগাছটাকে একদিন কেটে ফেলল কারা। সেখানে নাকি বাড়ি উঠবে। বটগাছটার কাটা ডাল থেকে কতকগুলো বটফল গড়াতে গড়াতে এসে পড়ল আমার ওপর। তারপর আমি আর বালির কণা রইলাম না, চারাগাছ হয়ে গেলাম। তখন আমি তোমারই মতন ছিলাম, শ্রীজাতকিশোর। এখন অবশ্য আর নই। এ সব যখন ঘটেছে তখন তুমি কোথায়! তাই তো তোমায় সব বলছি। ওই যেখানে বটগাছটা কাটা হয়েছিল, বাড়ি উঠবে বলে, সেখানে বাড়ি আর উঠল না। ভিত গাঁথা হল, পুজোআচ্চা হল, বাউন্ডারির পাঁচিল দেওয়াও আরম্ভ হয়েছিল, তারপরেই কোন শরিকে যেন মামলা করে দেয়। এত বছরেও তার নিষ্পত্তি হল না। ফলে জায়গাটায় এখন ভিতের ওপর শেয়ালকাঁটার ঝোপ। হলুদ হলুদ শেয়ালকাঁটার ফুল ঈষৎ বেগ্‌নি সবুজ পাতার ওপর ফুটে থাকে। বড় বড় কালকাসুন্দে গাছে ছোট্ট ছোট্ট নীলচে ফল হয়। ইশকুলের ছেলেরা ছুটির পর বাড়ি ফেরার সময় যদি ছিটকে এদিকে এসে পড়ে তা হলে ছিঁড়ে নিয়ে এ ওর গায়ে ছুড়ে মারে। ওই চৌহদ্দির মধ্যে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছও জন্মেছে। তার পেছনে মস্ত মাঠ। মাঠের মধ্যে দিয়ে তুমি সাইকেল চালিয়ে আসো, শ্রীজাতকিশোর। এসে বসে পড়ো আমার গুড়িতে পিঠ লাগিয়ে। সাইকেল শুইয়ে রাখো ঘাসে।

তোমার হাতে কখনও থাকে একটা খাতা, কখনও একটা বই। তুমি খাতা খুলে কীসব আঁকিবুঁকি কাটো, লেখ কিছু? আমি টুপ করে একটা পাতা ফেলে দিই তোমার খাতার ওপর, তোমার মাথার ওপরেও ফেলি। তুমি কি বুঝতে পারো, শ্রীজাতকিশোর? প্রথম প্রথম তুমি আসতে, এসে, গাছের নীচে বসে ঘুমিয়ে পড়তে। যেন তুমি কোনও রাখাল, তোমার মুখে সদ্যোজাত শ্মশ্রু, মাথায় কোঁকড়া চুলের ঝাঁক, সকালবেলার রোদ্দুরের মতো গায়ের রং। যা কিছুই তুমি দেখ না কেন, চোখ দেখে মনে হয় প্রথম দেখলে,—এত বিস্ময় তাতে। মাঝে মাঝে বিষাদও, কেন শ্রীজাতকিশোর! জগতের অনেক কিছুই তোমার মনের মতো নয় এই জন্যে? কটা জিনিসই বা আমাদের মনের মতো হয়, বল! নিজের ইচ্ছেমত কোনও কাজ কতদূর করা যায়! যায় না যে, তা তুমি সবে জানতে শিখছ। পরে আরও শিখবে, আরও কষ্ট পাবে। কিন্তু কীই বা করার আছে তাতে! ওই যে তোমার খাতা, আর তার আঁকিবুকি, ওরা তো চিরকালের জন্য কারও দুঃখ মোছাতে পারবে না। তুমি যখন বড়ো হবে, তখন যদি ধরে রাখো ওদের, যদি ওদের কথা জানতে পারে মানুষ, তা হলে দেখবে, সে সব মানুষের দুঃখের সামনে দিয়ে ওরা দু'-একবার উড়ে যাবে, তোমার ওই খাতার সব লেখা, তারা খাতা থেকে বেরিয়ে কারও কাঁধে বসবে। সে হয়তো খেয়াল করবে না প্রথমটা। যখন দেখবে, বলবে,—বাঃ কী সুন্দর! কিন্তু ততক্ষণে তুমি আবার উড়ে যেতে শুরু করেছ, একটা লেখা থেকে আরেকটা লেখায় তুমি উড়ে যাবে শ্রীজাতকিশোর। যদি ততদিন ওই পৃষ্ঠাভরা আঁকিবুকি তোমার সঙ্গে থাকে, তবে তারা অশান্তির আগুনের ওপর দিয়ে উড়ে যাবে, শোকের কপালে গিয়ে বসবে, দুঃখের চোখ মুছিয়ে দেবে, হাত রাখবে বন্ধুত্বের কাঁধে। প্রেমকে গিয়ে বলবে, দাও তোমার ঠোঁট।

আমি একদিন যেমন উড়ে বেড়িয়েছি আমার মথের জীবনে, আমার প্রজাপতির জীবনে, গাছের গায়ে যেমন বসেছি, উন্নত, সুঠাম, ঋজু গাছের গায়ে, তেমনই ভাঙা বাড়ির ময়লা দেয়ালে বিছিয়েছি আমার ডানা। একদিন, ...সেই এক জীবন ছিল আমার। আর আজ, এই জীবনে, যখন আমি গাছ, আর তুমি যখন এসে পিঠ ছুঁইয়ে বস আমার গুঁড়িতে, আমার ইচ্ছে করে দু হাতে তোমার মাথাটা টেনে নিই আমার বুকে। কপালে আমার স্নেহ ছোঁয়াই। কিন্তু গাছের তো হাত হয় না! গাছের তো ঠোঁট নেই, স্নেহের চুম্বন সে রাখবে কী করে! শ্রীজাতকিশোর, তুমি কালকে দুপুরে যখন এসেছিলে, তখন তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে আমার গুঁড়িতে মাথা রেখে। আর উঁচু উঁচু ঘাসের মধ্যে খোলা পড়ে ছিল তোমার খাতা। কয়েক মিনিটের ঘুম ভেঙে তুমি দেখলে সেই খাতার মধ্যে তোমার সদ্য লেখা কবিতার ওপর ডানা ছড়িয়ে বসে আছে একটা মথ। পাছে ওর কোনও অসুবিধে হয়, পাছে ও ভয় পায়, তাই তুমি চুপ করে বসে রইলে, অপেক্ষা করলে কখন ও নিজের মনে উড়ে যাবে! কিন্তু ও গেল না, বসে রইল, বসে রইল। ধীরে ধীরে সন্ধে নেমে আসতে লাগল, ঝিঁ ঝিঁ ডাকতে শুরু করল সামনের ঝোপজঙ্গল থেকে, ব্যাং লাফাল, গিরগিটি ছুটল সামনের পোড়ো পাঁচিলের ওপর দিয়ে, তখন তুমি আর অপেক্ষা করলে না। খাতাটাকে সাবধানে তুলে ধীরে ধীরে, পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলে আমারই একটা নীচু ডালের দিকে। তারপর খাতাটকে ডালের সামনে তুলে ধীরে, খুব আলতো করে ফুঁ দিলে একবার, দুবার। মথের ডানা কেঁপে উঠল। সে টুপ করে উড়ে গিয়ে বসল একটা নিরাপদ পাতায়। তুমি খাতা বন্ধ করে সাইকেল তুললে ঘাস থেকে। রওনা হয়ে গেলে। সন্ধের মাঠের মধ্যে তোমার সাইকেল নিয়ে মিলিয়ে গেলে তুমি। আজ সকালে দেখি,

ওই মথটা আমার পাতার ভেতর থেকে বেরিয়ে, ওই পোড়ো ভিত জঙ্গলের ওপারে চলে যাচ্ছে। ওই যে, যেখানে একটা টালির বাড়ি, যেখানে একটা রোগা বউ ধোঁয়াওঠা তোলা উনুন নামিয়ে রাখে উঠোনে, লুঙি আর বেগ্‌নে শাড়ি আর বাচ্চার কাঁথা শুকোতে দেয়, ওদের বাড়ির দিকে দেখি যাচ্ছে সে। আমি জানি শ্রীজাতকিশোর, ও একদিন তোমাদের বাড়িতেও যাবে, ও একদিন ডানা ছড়িয়ে বসবে তোমাদেরও দেয়ালে। তোমাদের দেয়াল ময়লা না ঝকঝকে, শ্রীজাতকিশোর? তোমাদের জানলা ভাঙা, না নতুন? তোমাদের দরজায় কি ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ হয়? তোমাদের কি বাড়ির সামনে উঠোন আছে? উঠোনে আছে সন্ধ্যামণি গাছ?

থাকুক, আর নাই থাকুক, শ্রীজাতকিশোর, ওই মথকে দেখলেই তুমি জানবে ও তোমারই মতো এক কবি। কারও দুঃখ ঘোচাতে পারে না, নেভাতে পারে না কারও অশান্তি। শুধু কয়েক পলকের জন্য উড়ে যেতে পারে শান্তি অশান্তির ওপর দিয়ে। ওকে দেখে যাতে দুঃখী মানুষ সন্তপ্ত মানুষ, অশান্তিতে অঙ্গার হয়ে যাওয়া মানুষ দু-এক মুহূর্তের জন্য বলে উঠতে পারে,—বাঃ! কী সুন্দর!